OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 37 - 46
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে মনসামঙ্গল কাব্য : প্রসঙ্গ সতীন সমস্যা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, পতিনিন্দা, বারোমাস্যা, ছদ্মবেশধারণ

ছন্দমঞ্জরী চ্যাটার্জী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : manjareec96@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Women, Sati, Polygami, Society, Psychology, Patriarchy, Self- reliance, Protest, Self-establishment.

Abstract
In our society women have been defined with certain words and terms which are used as the opposites to that of the men. A woman resides as a daughter, wife and mother, completely unaware of her own individuality. A society where woman is not allowed to know her own personality, it is quite normal that her deep feelings, her emotions are made to remain veiled forever. Moreover the patriarchy has termed her enchantress ('Mayabini', 'kuhokini') to avoid any reflection on the hidden core of her heart. Women have failed to transform their thoughts into works unlike men. But the condition of women was not the same right from the beginning in our Indian society. In the Vedic era women like Gargi, Maitreyee were ranked with the greatest of the menfolk in society. Towards the end of the Vedic period, in the age of the Ramayana and the Mahabharata women were allowed to exercise their freedom in selecting their husbands which was called the 'Swayambar Pratha,' and had their chances in widow remarriage. But the system changed with time. Women have lost their freedom and the perversion of men has made them to turn into their property. Society has not lend its ear to the heart- touching stories of these women. But in literature the poets despite being male, have always come out of their society defined roles and as human beings they have sung the minds of women. Later these hidden aspects of the minds of the female characters have come to be interpreted as feminine psychology. The poets of the medieval Bengali literature are not an exception. The works of the medieval Bengali literature especially the Mangalkavyas are the soulful accounts which are like the undercurrents in the main narratives of self establishment of the Gods and Goddesses. The hidden aspects of women psychology and the conflicts of their minds have been centered round the co-wife problems due to the polygamy system and their establishment of 'self'. The poets have opened up the complex sides of the feminine psychology in themes of 'Baromasya', the narration of twelve months and the condemnations for their husbands. This article tries to analyse how the poets of the Manasamangal Kavya have depicted the thoughts

and the inner conflicts of the feminine psychology through various activities of the female characters.

Discussion

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"[১]

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে এভাবেই সমাজে নারীর অবস্থানটিকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে স্ত্রীজাতিকে তার কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষা করে। স্ত্রী কখনোই স্বাধীনতার যোগ্য নয়। অর্থাৎ, নারী কেবল পুরুষের সামাজিক অবস্থানের বিপরীতে কিছু শব্দের ধারক মাত্র। কন্যা, স্ত্রী ও জননী এই তিন শব্দের অন্তরালে নারীর অবস্থান। নারীর যে পৃথক ব্যক্তিসত্তা থাকতে পারে সে সম্পর্কে নারীই অজ্ঞাত। যে সমাজ তার পৃথক ব্যক্তিসত্তাকেই অপরিচিত করে রেখেছে সেখানে তার হৃদয়ের গভীর অনুভূতিগুলি যে চিরকাল রহস্যাবৃত থাকবে তা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। নারীকে মায়াবিনী, কুহকিনী, রহস্যময়ী বলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার হৃদয়ানুভূতিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে চিরকাল। সমাজে পুরুষ যতটা তার মননকে কার্যে রূপান্তরিত করতে পেরেছে নারী তা পারেনি। কিন্তু ভারতীয় সমাজে নারীর এই অবস্থা চিরকাল সমান ছিল না। বৈদিক যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ীর মতো বিদুষী নারীরা ছিলেন পুরুষের সাথে সমান আসনে আসীন। সমাজের পাশাপাশি সাহিত্যেও নারীর অবস্থান সম্মানেরই ছিল। বৈদিক যুগের শেষদিকে রচিত রামায়ণ ও মহাভারত-এর মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে এক নারীকে ঘিরে। নারীর সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের লড়াই সেইসব কাহিনির মূল বিষয়। তখনও ছিল স্বয়ম্বরপ্রথা ও বিধবাবিবাহের মতো নারী স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত। সময় এগিয়েছে আর তার সাথে পাল্টেছে সমাজ; প্রবর্তিত হয়েছে নতুন নতুন নিয়ম। সেই নিয়মের আগড়ে আবদ্ধ হয়েছে কেবল নারী। নারী তার অধিকারবোধের চেতনাকে হারিয়ে ফেলেছে। অপরদিকে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথার নামে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী পরিণত হয়েছে পুরুষের সম্পত্তিতে। বসনে ভূষণে ঢেকে রেখে কেবল পুরুষের অঙ্কশায়িনী করে রাখা হয়েছে তাকে; শোনানো হয়েছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'-র মতো শাস্ত্রীয় বচন। এহেন নারীর মনের কোণের গোপন কথা শোনার শ্রোতা সমাজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সাহিত্যে পুরুষ কবিরা তাদের লিঙ্গ পরিধির বাইরে গিয়ে কেবল মানুষ হয়ে মানবদরদী মন নিয়ে নারীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে নারীর হৃদয়রাজ্যের গোপন কুঠুরিগুলি উন্মোচন করেছেন। মধ্যযুগের কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন। মধ্যযুগের সাহিত্যগুলির মধ্যে বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলি তো দেবদেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনির অন্তরালে বয়ে চলা নারীর অশ্রুসজল কাহিনির ফল্গুধারা। মনসামঙ্গলের কাহিনিতেও তাই নারীদেরই প্রাধান্য। নারীচরিত্রগুলির ভাবে ভাষায় ফুটে উঠেছে তাদের মনোলোকের গোপন কথা।

মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল তুর্কি বিজয়ের পর। এর পূর্বে ছিল সেন রাজাদের রাজত্ব; যারা ব্রাহ্মণ্যবাদকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজে কৌলীন্যপ্রথাকে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। শাসক বদলেছে কিন্তু বদলে যায়নি কুপ্রথা। এই কৌলীন্যপ্রথা বাঙালি সমাজে ভয়ানক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল। বহুবিবাহ যেমন পুরুষের বহুদার গ্রহণের অবাধ দ্বার খুলেছিল তেমনি নারীজীবন কণ্টকিত হয়েছিল সতিন সমস্যায়। সংসার হয়ে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র। ছলে বলে কৌশলে সংসারে একাধিপত্য স্থাপনই একমাত্র উদ্দেশ্য হল। মধ্যযুগের এই সামাজিক পরিস্থিতিতেই মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ রীতি অনুযায়ী মনসামঙ্গলকাব্যের শুরুতেও দেবকাহিনি রয়েছে। পৌরাণিক আবহের মধ্যেও সেখানে কবিরা স্থান দিয়েছেন সমাজবাস্তবতাকে। দেবকাহিনিতে তাই দেবদেবীর সংসারে সাধারণ নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। শিব-চণ্ডীর সংসারে বাঙালি গার্হস্থ্যের ছবিটি ফুটে উঠেছে। সেখানেও সংসারে নারীর একাধিপত্য স্থাপনের লড়াই চলেছে যাকে কেন্দ্র করে চণ্ডী-মনসা-গঙ্গা এই তিন দেবীর আচরণে তাদের মনস্তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির শুরুতেই দেখি কালিদহে শিবের গমনের কারণ সম্পর্কে চণ্ডী অজ্ঞাত। তার মনে কোনো প্রশ্নও জাগে নি। কিন্তু দেব নিরঞ্জন যখনই বলেছেন, শিব যদি কালিদহে যায় তাহলে তাঁকে নারী রূপে দেখতে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পাবে তখনই চণ্ডীর মনে সন্দেহ জেগেছে। শিবের চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক নয় তা সে জানে। শিবকে পরীক্ষা করতে তাই ডোমনারীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে সে। চণ্ডীর অনুমান মিলেও গেছে। কালিদহ থেকে আগত শিবের সাথে সুন্দরী মনসাকে দেখে চণ্ডীর ক্ষোভ তাই অমূলক নয়। প্রথমত বারংবার অনুরোধের পরও শিব তাকে কালিদহে নিয়ে যেতে চায়নি। তাছাড়া, ছদ্মবেশে সে দেখেছে শিবের কামুক স্বভাব। এরূপ স্বামীর উপর অবিশ্বাস করা তাই স্বাভাবিক। চণ্ডী তাই মনসাকে সপত্নী আশঙ্কা করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তার উপর অত্যাচার শুরু করেছে-

"বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়।
মারনের ঘায় পদ্মা করে থরথর।।"[২]

মনসা তাকে নিজের পরিচয় দিলেও তার সন্দেহ ঘোচেনি। অতীব সুন্দরী মনসাকে শিবের লুকিয়ে রাখা চণ্ডীর সন্দেহকে আরও বেশি বাড়িয়ে তুলেছে-

"চণ্ডী বলে মোর ঠাঁই না রহে নারী কলা।
মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা।।"[৩]

প্রাপ্তবয়স্কা চণ্ডীর সংসারে যুবতী মনসার আগমন, তার মনে ভয়ের সঞ্চার করেছে। স্বামী ও সংসারের উপর অধিকার হারাবার আশঙ্কায় সে মনসাকে কুরুচিকর আক্রমণ করেছে। কিন্তু, তারপরও মনসার প্রতি চণ্ডীর বিদ্বেষ বিন্দুমাত্র কম হয়নি। মনসার চোখ নষ্ট করে তার সৌন্দর্যহানি ঘটিয়ে ও তাকে নিজ সংসার থেকে দূরে নির্বাসনে পাঠিয়ে চণ্ডী মানসিক শান্তি পেতে চেয়েছে।

অপরদিকে মনসা মাতৃহীনা। পিতার বর্তমানেও পিতৃগৃহে ঠাঁই হয়নি তার। জন্মের পর থেকেই এক ধরণের অনিশ্চতায় সে ভুগেছে। তাকে দেখে প্রথমেই তার নিজের পিতা কামনায় জর্জরিত হয়েছে। পরে সেই পিতা তাকে কন্যা হিসেবে মর্যাদা দিলেও সৎমা চণ্ডীর প্রকোপ থেকে সে বাঁচতে পারেনি। দেব সমাজে নিন্দার ভয়ে শিব মনসাকে চণ্ডীর নির্দেশে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। সে যুগে সমাজে অবিবাহিতা নারী যে কতটা অনিশ্চয়তায় ভুগত তা মনসা ও নেতার মাধ্যমে বোঝা যায়। শিব বিষপানে মৃতবৎ, এই সংবাদ শুনে তারা কষ্ট পেয়েছে। কিন্তু, তার থেকেও বেশি চিন্তিত হয়েছে একথা ভেবে যে, পিতা মারা গেলে কে তাদের বিবাহ দেবে-

"কে পালিবে আমা সভা কে আর দিবে বিভা
কান্দে দেবী ভাবি মন-দুঃখে।।"[৪]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিতার পরে নারীর অভিভাবক হয় তার স্বামী। মনসা ও নেতা যতই দৈবীশক্তি সম্পন্ন হোক নিজেদের বিবাহ তারা নিজেরা স্থির করতে পারবে না একথা জানে। তাছাড়া অভিভাবকহীন নারীর যে সামাজিক বিপন্নতাবোধ তা তাদের চিন্তায় ফেলেছে।

কিন্তু এই বিপন্নতাবোধও সাময়িক। মনসার লক্ষ্য ভিন্ন আর সেই লক্ষ্যে সে অবিচল। যেদিন থেকে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যেন এক অনাথা নারীর সামাজিক মর্যাদা লাভের সংগ্রাম। মনসার কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করতে গেলে তাই প্রথমে এক সর্বহারা নারীর মনস্তত্ত্বকে বুঝতে হবে। চণ্ডীর কারণে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ক্ষোভ ভুলতে পারেনি মনসা। তাই একে একে নিজের প্রতি হওয়া অবিচারের শোধ নিয়েছে সে। সেই সুযোগও এসেছে। বিষপানে অচৈতন্য শিবের চেতনা ফেরাতে সক্ষম একমাত্র মনসা। সঠিক সময়ে দেব সমাজের সামনে চণ্ডীর ভালমানুষির মুখোশ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে তাই কৌশলে চণ্ডীর কাছ থেকে বস্ত্র চেয়েছে। আর সৎমেয়েকে জব্দ করতে, অপদস্থ করতে চণ্ডী 'হাত পাঁচ কাঁচা খানি'[৫] বস্ত্র পাঠিয়েছে। মনসাও দেব সমাজকে চণ্ডীর আসল চেহারা দেখিয়েছে -

"দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যত্নে সেই বস্ত্র মোরে দান কৈল সত্তা।।"[৬]

সকল দেবতাকে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত মনসার স্তুতি করতে দেখেছে চণ্ডী। মনসার গুরুত্ব দেবসমাজে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে-

"ক্রোধে চণ্ডী উঠিল তেজিয়া লাজভয়।
মারিবারে মনসারে মুষ্টিক উঠায়।।"[৭]

ঠিক এরকম ঘটনারই অপেক্ষা করেছিল মনসা। সৎমায়ের আসল স্বরূপটি তুলে ধরার পরিকল্পনাকে এভাবেই সফল করে তুলেছে সে। নারী যেমন সহনশীলা তেমনি সময়বিশেষে নিজের আত্মসম্মানে আঘাতকারীর প্রতি নির্দয়াও হতে পারে। সকলের উপেক্ষা ও অবহেলার পাত্রী থেকে এভাবেই আত্মমর্যাদা স্থাপনের প্রথম ধাপটি মনসা নির্মাণ করে।

মনসার কারণে চণ্ডীর সংসারে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল। দেব সমাজের কাছে তার অমর্যাদা হয়েছে সৎমেয়ে মনসার কারণেই। তাই তার বৈবাহিক জীবনও সুখের হতে দিতে রাজি নয় চণ্ডী। সে কৌশলে মনসাকে সর্পাভরণে সাজতে নির্দেশ দিয়েছে; যার ফলে মনসাকে ত্যাগ করেছে তার স্বামী জরৎকারু মুনি। এইভাবে মনসাকে স্বামীপরিত্যক্তা করে চণ্ডী তার প্রতিহিংসা মিটিয়েছে। শুধুমাত্র সপত্নী আশঙ্কায় নারী কীভাবে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে তা চণ্ডী ও মনসার বিবাদের প্রথমদিকে ধরা পড়ে। মনসা তার সৎ মেয়ে তা জানার পরেও চণ্ডীর আক্রোশ বিন্দুমাত্র কমেনি। আসলে শিবের কামুক স্বভাবের সরাসরি প্রতিবাদ করতে না পেরে সমস্ত বিদ্বেষ-বিষ উগড়ে দিয়েছে মনসার উপর।

চণ্ডী-মনসার বিবাদ ছাড়াও কাব্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মনসার সকল আচরণই অত্যধিক ক্রূরতা অথবা অত্যধিক মমতা মেশানো। চাঁদ সদাগরের সাথে দ্বন্দ্বেও তার প্রতিশোধ নেওয়ার মানসিকতাই বেশি। আসলে জন্মের পর থেকেই মাতৃহীনা যে নারী কেবল দুঃখ পেয়েছে, পিতৃগৃহ থেকে নির্বাসিত হয়েছে, সৎমায়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে, তার মধ্যে যে প্রতিশোধস্পৃহা প্রবল হবে তা তো স্বাভাবিক। মনসার আচরণের পশ্চাতে পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীনা ও স্বামী পরিত্যক্তা এক সাধারণ নারীর মনস্তত্ত্বই কাজ করেছে।

কৌলীন্য প্রথার যুগে সংসারে নারীর একমাত্র কামনা ছিল একা ঘরে একেশ্বরী হওয়া। সপত্নীর উপস্থিতিতে তাদের সে স্বপ্ন কখনোই বাস্তবে পরিণত হ'ত না। অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তারা হয়ে উঠেছে সংকীর্ণমনা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে চণ্ডী বা দেবী পার্বতীর সহোদরা হিসেবে গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে। শিবের সাথে তার বিবাহের কথাও সেখানে রয়েছে। এরই সাথে স্বামী শিবের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার কারণে গঙ্গা ও পার্বতীর কলহের কথাও পুরাণে বর্ণিত। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে তারই প্রসঙ্গ রয়েছে। একে অপরের সপত্নী হয়ে তারা সহোদরা সম্পর্ক বিস্মৃত হয়েছে। মনসার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে গঙ্গা চণ্ডীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সতিন গঙ্গাকে দেখে চণ্ডীর ক্রোধ আরও বেড়ে গেছে। প্রচণ্ড বিদ্বেষে গঙ্গার চরিত্রের উপর প্রশ্ন তুলেছে সে-

"বলে ভাল জানি জনা, যাহার মত সতীপনা,
তাহাত মুই জানি ভাল মতে।
আনিতে ভগীরথে, ঠেকিলা পর্ব্বত পথে,
শৃঙ্গার মাগিলা ঐরাবতে।।"[৮]

গঙ্গাও এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। সেও দিয়েছে চণ্ডীকে দু-চার কথা শুনিয়ে -

"যাহার তাহার ঘরে যাও, মৎস্য মাংস বলি খাও,
সেও কি আরেরে বলে মন্দ।।"[৯]

দেব কাহিনির অন্তরালে এভাবেই সপত্নী সমস্যা জর্জরিত সংসারে নারীর লাঞ্ছিত জীবনের বেদনার কথা কাব্যে উঠে এসেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে সনকা ও বেহুলা এই দুই সাধারণ নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অসাধারণ প্রতিভায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবিরা। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকার মধ্যে জায়া ও জননী এই দুই সত্তার প্রকট রূপ দেখতে পাওয়া যায়; যা তার সমস্ত কর্মের নিয়ন্ত্রক। শৈশব থেকেই কন্যাসন্তানকে সমাজ আদর্শ পত্নী ও মাতা হওয়ার শিক্ষা দিয়ে থাকে। সনকার মধ্যে সেই সামাজিক শিক্ষারই প্রতিফলন ঘটেছে। চাঁদ বণিক আর মনসার লড়াইয়ে সবথেকে বেশি ক্ষতি তারই হয়েছে। ধনী বণিকের অন্তঃপুরে কোণঠাসা তার জীবন। সেখানে তার মতামতের কোনো দাম নেই তবুও সংসারে শান্তি কামনাই সনকার একমাত্র লক্ষ্য। চাঁদের একজেদী স্বভাবের কাছে তাকে তার সমস্ত অনুভূতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। স্ত্রীকে শুধু সন্তান ধারণের যন্ত্র ভেবেছে সে। পুত্রশোকে কাতর সনকাকে তাই খুব সহজেই সে প্রবোধ দিয়ে বলতে পেরেছে-

“তোমা আমা কুশলে থাকিলে দুইজন।
দুই বৎসরের পরে হবে এক এক নন্দন।।”[১০]

সদ্য সন্তানহারা সনকার কাছে চাঁদের এই প্রস্তাব চূড়ান্ত অপমানের। স্বামীর কারণে সনকা তার পুত্রদের হারিয়েছে; তাই নতুন করে স্বামীর সাথে সুখস্বপ্নে মজে যেতে ঘেন্না লেগেছে তার। স্বামীসহবাস ত্যাগ করেছে সনকা। সন্তান বিয়োগ ব্যাথায় জর্জরিত মায়ের নতুন করে সন্তান ধারণ করে তপ্ত হৃদয় জুড়াতে চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সনকা জানে এভাবে সে চাঁদের আচরণের প্রতিবাদ করতে পারবে না। আবারও সে সন্তানহারা হবে আর সেই যন্ত্রণা শুধু তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে।

তবে, শুধুই বেদনা বা প্রতিবাদ নয়, সনকার এই সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল আরও বড় কারণ। যে সংসারে অকালবিধবা হয়ে নবযৌবনা ছয় বধূ তাদের আনন্দহীন জীবন কাটাচ্ছে সেই একই সংসারে থেকে কি করে সে স্বামীসহবাস করবে? কীভাবে স্বামী সঙ্গলাভ করে আবারও সন্তানধারণ করবে সে? এ তো চরম লজ্জার বিষয় হবে তার কাছে –

“বাহু তুলি চন্দ্রধরে করে আলিঙ্গন।
লাজে মুখ ঢাকী সোনাঞি বুলিল বচন।।
লাজ নাহি চান্দ তোর মুখে পাকা দাড়ি।
ঘরেতে জাগয় মোর ছয় বধূ রাড়ি।।”[১১]

কিন্তু পরিস্থিতির কাছে সনকাকে হার মানতে হয়েছে। সে যুগে সংসারে নারী ছিল পুরুষের আশ্রয়ে আশ্রিতা। শ্বশুরের অবর্তমানে কার আশ্রয়ে দিনযাপন করবে তা ভেবে সনকার পুত্রবধূরা চিন্তিত। হতভাগ্য এই বধূদের আবেদন সনকা অগ্রাহ্য করতে পারেনি; সে রাজি হয়েছে। তবুও স্বামীর প্রতি তার অভিমান, ক্ষোভ যেন তাকে আড়ষ্ট করে রেখেছে। তাই স্বামী সহবাসে যাওয়ার পূর্বে অলঙ্কার দিয়ে তাকে সাজানো হলে –

“সিচিয়া ফেলায়া সোনাঞি লাগিল কান্দিতে”[১২]।

সনকার সকল আচরণের মূলে তার নারী মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একপেশে মনোভাবের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। সনকা তার এই প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ হয়তো দেখেছিল পুত্রবধূ বেহুলার মধ্যে। বেহুলার প্রতি ছিল তার অটুট বিশ্বাস। বেহুলা যে তার সকল আশার বাস্তব রূপদান করতে সক্ষম সেই ভরসা ছিল। কিন্তু পুত্র লখিন্দরকে হারিয়ে সনকার সেই বিশ্বাসও মুহূর্তে টলে গেছে। বেহুলাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে আবার কখনো পুত্রের অবর্তমানে তাকে দেখে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। সবসময় এক দোলাচলতায় আন্দোলিত হয়েছে সনকার মন। সনকা যে কতটা মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল তা তার এইসমস্ত পরস্পর বিরোধী আচরণগুলিই প্রমাণ করে। পুত্রের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকে অপয়া ভেবেছে সে। আবার বাকি সকলের মতো লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনা বেহুলাকে ‘অসতী’ বলতে বাধেনি সনকার। চাঁদ-মনসার দ্বৈরথের কথা ভুলে গিয়ে সকল অনিষ্টের জন্য বেহুলাকে অভিযুক্ত করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই নারীর মনে গেঁথে দেয় কিছু কুসংস্কার আর তা আজন্ম সেখানে লালিত হয়। সংসারে সকল কল্যাণ-অকল্যাণের দায় পড়ে নারীর উপর আবার নারীর চরিত্রে কালিমালেপনও খুব সহজেই করা হয়। এর ফলে

একজন নারী অসহায় আরেক নারীর পাশে এসে দাঁড়ায় না; বরং তার বিপক্ষে চলে যায়। একজন নারী হয়েও সনকা সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মনোভাবকেই বহন করেছে।

মনসামঙ্গলে চাঁদ-মনসার দ্বৈরথের মাঝে বেহুলা শুনিয়েছে আত্মবিশ্বাসের কাহিনি। আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সে অনায়াসে দৈবীশক্তিকে পরাজিত করেছে। প্রবল প্রতাপশালী চাঁদ বণিকের পুত্রবধূ হওয়ার জন্য শুরু থেকেই তাকে দিতে হয়েছে একের পর এক পরীক্ষা। কিন্তু কোনো পরীক্ষাতেই সে হেরে যায়নি। নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে সে জয়ী হয়েছে সকল পরীক্ষায়। লোহার কলাই সিদ্ধ করার পরীক্ষা নিয়েছে চাঁদ। সকলের কাছে তা অসম্ভব মনে হয়েছে কিন্তু বেহুলা হার মানেনি। তাকে দেখতে এসে তার অসফলতার কাহিনি নিয়ে ফিরে যাবে একথা যেন তার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। নিজের উপর প্রবল আস্থা রেখে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সহজে পরাজিত না হওয়ার মানসিকতাই বেহুলাকে সকল যুদ্ধে জয়ী করেছে।

তার বিবাহ হয়েছে ভাগ্যবিড়ম্বিত লখিন্দরের সাথে। চাঁদ সদাগর জানত লখিন্দরকে একমাত্র বেহুলাই বাঁচাতে পারে। বেহুলা চাঁদ বণিকের সেই ভরসার মর্যাদা দিতে চেয়েছে বারংবার। তাই নারীজীবনের সবথেকে আনন্দের মুহূর্ত তার প্রিয়মিলনের রাত্রিতেও নিজের চেতনাকে হারিয়ে ফেলেনি। বেহুলা জানে এক মূহূর্তের অসচেতনতায় বিপদ ঘটতে পারে। আর সে হারিয়ে ফেলতে পারে সকলের ভরসা, বিশ্বাস সবকিছু। কিন্তু দৈবকে সে রুখতে পারেনি। লখিন্দরের মৃত্যু হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে প্রবেশের শুরুতেই তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেছে। সমাজ তাকে অপয়া ভেবেছে। শাশুড়ি সনকাও তাকে কটু কথা শুনিয়েছে-

"খণ্ড কপালিনী তুঞি চিরণিয়া দাঁতি।
বিভাদিনে পতি খালি, না পোহাল্য রাতি।।"[১৩]

বেহুলা প্রতিবাদ করেছে। এই দোষের ভাগী হতে সে নারাজ। চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্বের কারণে যে এর আগেও সনকার ছয়পুত্র মারা গেছে তা মনে করিয়ে দিয়েছে সে -

"আমাকে রাক্ষসি বাউলান বোল তুমি কিসে।
আর যে ছয় ভাসুর মৈল সেহ কী আমার দোসে।।"[১৪]

সমস্ত অপবাদ শুনেও বেহুলা সংসারে থাকতে পারত। আর ছ'জন জা এর মতো বৈধব্য জীবন পালন করতে পারত। কিন্তু কি হত তার ব্যক্তিত্বের? বেহুলা বুঝতে পেরেছে স্বামীহীন সংসারে তার কোনো মূল্য নেই। বাসররাতেই লখিন্দরের মৃত্যুকে ঘিরে স্বজন পরিজনের মধ্যে তাকে লক্ষ্য করে নিন্দার যে সুর শোনা গেছে তা চিরকাল তাকে দগ্ধ করবে। চাঁদ ও মনসার বৈরিতার কথা ভুলে গিয়ে তার দিকে আঙুল তুলেছে সমাজ। এই অপমানের ভার বেহুলার মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বামীর বিয়োগ ব্যথার মধ্যেও সে তাই নতুন করে আশার স্বপ্ন বুনেছে। মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে পাড়ি দিয়েছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। যাত্রার পূর্বে ভাইয়েরা তাকে ফেরাতে চাইলে বলেছে-

"বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী।
কত-না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি।।
মা-বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাউজ-সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে।।
নারিব সহিতে আমি দুরাক্ষর বাণী।
কূলে দাণ্ডাইয়া দাদা আর কান্দ কেনি।।"[১৫]

কিশোরী হলেও বৈধব্য জীবনের জ্বালা সে বোঝে। অকালে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে সুদীর্ঘ জীবন নিরামিষ আহার করে আর ভ্রাতৃবধূদের গঞ্জনা সহ্য করে কাটাতে হবে; সেখানে আর পূর্বের মতো স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে না তা সে বুঝতে

পেরেছে। স্বামীহীনা নারী সকলের উপেক্ষার, অবহেলার পাত্রী হবে বেহুলার মতো আত্মসম্মানী নারীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'সতী' নামক ধারণাকে বেশি মান্যতা দেওয়া হয়েছে; যা নারীদের শিখিয়েছে পতিব্রতা হয়ে উঠতে। বেহুলাও নিজেকে সতীনারী প্রমাণ করতে আগ্রহী ছিল। একাকী পথযাত্রায় তাকে অজস্র বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেইসমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে তার স্বামী-সংস্কার মুহূর্তের জন্যও বিভ্রান্ত হয়নি। কিন্তু, সেই সময় আদর্শ ও বাস্তবের এক তীব্র মনস্তাত্ত্বিক সংগ্রাম বেহুলার মধ্যে ঘটেছে।

স্বামীর প্রাণ ফেরাতে দেবতাদের মনোভাব বুঝে অধীত বিদ্যাকে কাজে লাগিয়েছে। বিনামূল্যে যে কিছুই পাওয়া যায় না আর স্বর্গও যে তার ব্যতিক্রম নয় তা বেহুলার মতো সচেতন নারী জানে। বাধ্য হয়ে দেবী মনসার শর্ত মেনে সে মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। স্বামীহীনা নারী সংসারে কতটা অসহায় তা বেহুলার মতো সহৃদয়া নারী অনুভব করেছে। আর তাই তার ছ'জন জা-এর অকাল বৈধব্য দূর করতে ভাসুরদের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। স্বার্থপরের মতো কেবল নিজের সুখের কথা ভাবেনি সে।

বেহুলা প্রথমেই স্বামীর সাথে শ্বশুর ঘরে প্রবেশ করেনি। তার নারীমন আগে থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল একাকী নারীর পথযাত্রাকে সন্দেহের চোখেই দেখবে সমাজ। তাই সে ডোমনারীর ছদ্মবেশে পরিবারের সকলের মনোভাব জানতে চেয়েছে। পরিবারের সবাই তাকে মনে তো রেখেছে কিন্তু প্রিয়জনের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই পেয়েছে চরম আঘাত। বেহুলার চরিত্রে সন্দেহ করা হয়েছে। প্রচণ্ড দুঃখে হৃদয় জর্জরিত হলেও সে তার শেষ কর্তব্য করে অর্থাৎ লখিন্দরকে পরিবারের সাথে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে। বেহুলা স্বামীপ্রেমে গরবিনী। নিজের সমস্ত সাধ আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে নানা বিপত্তিকে পিছনে ফেলে বহু কষ্টে সে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে। বেহুলার অটুট বিশ্বাস ছিল লখিন্দরের উপর। তার ভরসা ছিল যে সংসারে সকলে তার চরিত্রে কালিমালেপন করলেও তার স্বামীর মনে এই ধরনের সন্দেহ জাগবে না কোনোদিন। শ্বশুর ঘরে অপমানিতা বেহুলা তাই তাড়াতাড়ি নৌকায় লখিন্দরের কাছে ছুটে এসেছে-

"লখাই এড়িয়া বেহুলা শান্ত নহে চিত।
ত্বরিত গমনে গেল গাঙ্গরীর ভিত।।"[১৬]

কিন্তু ততক্ষণে লখিন্দরের মনেও সন্দেহ দানা বেঁধেছে, বেহুলার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছে। বেহুলাকে সে জানিয়েছে-

"মনসুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয় মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোক করিবে উপহাস।।"[১৭]

লখিন্দরের কাছ থেকে আসা এই অপমান বেহুলা আর সহ্য করতে পারে নি। যে নারী বিবাহের সাজসজ্জা মলিন হওয়ার পূর্বেই মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গের অজানা রাস্তায় পাড়ি দিয়েছে, নিজের সতীত্বের জোরে স্বামী সহ আরও ছয় ভাসুরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে সেই নারীর উপরই অসতী হওয়ার অভিযোগ করেছে সমাজ। বেহুলা বুঝতে পেরেছিল পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে যে নারী একবার স্বতন্তরা হয়ে ঘরের বাইরে পা রেখেছে তার চরিত্রের কালিমা কোনদিনই ঘুচবে না। তাকে বারবার সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে যেতেই হবে। তাই যে সতীত্ব বেহুলার একমাত্র আশ্রয়স্থল সেখানেও প্রশ্নচিহ্ন আঁকা হলে শেষবারের মতো সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে সে বিদায় নিয়েছে সংসার থেকে। সতী প্রমানিত হয়ে আর ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নগুলোকে উপভোগ করতে চায়নি; হেলায় ত্যাগ করেছে সকল কামনা। ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে নিজেকে আর অপমান করতে পারেনি। প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী বেহুলা প্রত্যেকবারের মতো এবারেও 'আত্মমর্যাদা'-কে সবকিছুর উপরে রেখেছে। এইভাবে সে যেন একপ্রকারে তার প্রতি হওয়া অপমানের বদলা নিয়েছে। বেহুলার সতীত্বের কাহিনি নির্মাণে কবিরা এভাবেই তার নারীমানসের সকল দিকগুলিকে কাব্যে তুলে ধরেছেন।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যেও তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি পরিস্ফুট। এদের মধ্যে কিছু কিছু সামাজিক রীতির পালনকারী কেবল নারীরা। সেসব জায়গায় পুরুষের কোনো ভূমিকা নেই। সেরকমই একটি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 06
Website: https://tirj.org.in, Page No. 37 - 46
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জায়গা হল বিবাহ বাসর; যেখানে কেবল নারীর আধিপত্য। বিভিন্ন স্ত্রীআচারের সাথে সেখানে যুক্ত থাকে তারা। আর এই স্ত্রীআচার অংশেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটি যুক্ত করেছেন। কিন্তু কেবল প্রচলিত কাব্যরীতি হিসেবেই কবিরা এই অংশের অবতারণা করেননি। সমগ্র মধ্যযুগে কৌলীন্য প্রথা যে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল সেই সমাজবাস্তবতার দায়কে তাঁরা উপেক্ষা করতে পারেননি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এর মতোই কবি বিপ্রদাস ও বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের এই অংশগুলি তাই কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। নারী তার প্রার্থিত পুরুষের সাথে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনে। সেই স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ; জোর করে বিয়ে দেওয়া হয় যার তার সাথে। বর বেশে লখিন্দরকে দেখে স্ত্রীগণের আচরণে তাদের অন্তরের সেই অবদমিত কামনাই পরিস্ফুট হয়েছে-

"আর আইয় ভাবে দুঃখ চাহিয়া লখাইমুখ
শিশুকালে বিভা হইল কেনি।
আমি হেন-রূপ হই বিবাহে কুরূপ পাই
চক্ষু খাইল জনক জননী।।"[১৮]

লখিন্দরকে দেখে বৃদ্ধারাও বিগত যৌবনের শোকে অনুতাপ করেছে। তাদের কপালে মনোমতো স্বামী জোটেনি বলে তাদের সব সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। বয়স বাড়লেও যে মনের বয়স হয়নি। রসিকতার ছলে তাই তাদের মনের গোপন ইচ্ছের প্রকাশ ঘটেছে-

"বিস্তর তাম্বুল ভোগে দশন পড়িল বেগে
মোরে বুড়ি বলে চক্ষুশোকী।।"[১৯]

নারীদের পতিনিন্দার মধ্যে দিয়ে এভাবেই নারী মনস্তত্ত্বের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি উঠে এসেছে মনসামঙ্গলকাব্যে।

মঙ্গলকাব্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল নারীর বারোমাস্যা বিবরণ। বারোমাস্যাতে নারীর মনের কথা উদ্ভাসিত। নারী জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সকল কামনা-বাসনার বিস্তৃত বিবরণ মেলে এই বারোমাস্যা অংশে। নারী তার মনকে সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরেছে এই অংশে। কোথাও সে বিরহিনী, কোথাও বা দারিদ্র্যের কারণে ক্লিষ্ট। তবে মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়ের রূপটিই ধরা পড়ে। দেবী মনসার বারোমাস্যাতে আর বেহুলার ষন্মাস্যাতে তাদের এই দুই বিপর্যস্ততার ছবিই রয়েছে। দুই নারী তাদের দুরকম সংগ্রামের কথা বলেছে। দেবসমাজে দেবীর সম্মান পেতে চাঁদ বণিকের সাথে মনসাকে যে কত লড়াই করতে হয়েছে, কতরকমভাবে অপমানিত হতে হয়েছে, তাকে কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তারই বিবরণ দিয়েছে-

"এত ধন দিলাম বেটা তবু নহে বুঝে।
আমা বই আর যত দেবগণ পূজে।।
... ...
দুই হস্ত পাতিয়া আমি মাগিলাম ফুল পানি।
হেলায় না দিল ফুল আরো বলে কাণী।।"[২০]

অন্যদিকে, বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গের অজানা রাস্তায় পাড়ি দিয়েছে। বৈশাখ থেকে আশ্বিন এই ছয় মাসে বিবাহ থেকে শুরু করে তার সেই অজানা যাত্রাপথের সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করেছে সে। কীভাবে পেরিয়ে এসেছে নানা বিপদ, ত্যাগ করেছে নানা প্রলোভন তার বিবরণ দিয়েছে। পথের সমস্ত সংগ্রামের কথা একজন নারীকে বলে সে যেন কিছুটা অবসাদ মুক্ত হতে চেয়েছে-

"মহাসুখে বাস করে সবে পতি সঙ্গে।
আমি অভাগিনী ভাসি সাগর তরঙ্গে।।

আষাঢ় মাসেতে আমি পড়িলাম দায়।
ঘাটের খেয়ানী বেটা মোরে নিতে চায়।।"[২১]

বেহুলার এই ষন্মাস্যা বিবরণের পশ্চাতে লুকিয়ে আছে আরও গভীর এক উদ্দেশ্য। লখিন্দরের প্রাণ ফেরাতে প্রথমে অসম্মত হয়েছে মনসা। আর তাই বেহুলা নিজের দুঃখগাথা গেয়ে মনসার মনে তার প্রতি সহানুভূতি তৈরী করতে চেয়েছে।

চণ্ডীর ডোমনীবেশ ধারণ বা মনসার বার বার ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যেও নারী মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্য লুকিয়ে আছে। রূপ ও যৌবন হল নারীর দুই প্রধান শক্তি; যার দ্বারা তারা নিজ কামনা চরিতার্থ করতে চায়নি বরং শক্তিশালী পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের কার্যসিদ্ধি করেছে। নারী জানে সাধারণ ভাবে কখনোই জয়ী হতে পারবে না। তাই তার দৈহিক সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগিয়ে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছে।

মনসামঙ্গলের কবিরা যে নারীহৃদয়ের অন্তঃস্থলের খবর জানতেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁদের কাব্যের প্রতি স্তবকে স্তবকে। পুরুষের বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে সপত্নীজনিত সমস্যা, সংসারে ও সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নারী মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক কাব্যগুলিতে ফুটে উঠেছে। 'বারমাস্যা' ও 'নারীগণের পতিনিন্দা'র মতো বিষয়গুলির দ্বারাও নারী মানসের জটিল গ্রন্থি খুলেছেন কবিরা। নারীজীবনের সুখদুঃখ বিজড়িত ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই সেদিনের কবিদের মনে রেখাপাত করেছিল। তাই তাঁরা তাদের কাব্যের প্রতিটি নারীচরিত্রের কার্যকলাপকে মনস্তাত্ত্বিকতার আলোকে অঙ্কন করে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন সমগ্র পাঠক সমাজের সম্মুখে।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), মনু-সংহিতা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬, পৃ. ৭৫৬
২. ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার (সংকলিত), কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃ. ১৭
৩. তদেব, পৃ. ১৭
৪. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কোলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৮
৫. তদেব, পৃ. ৩৮
৬. তদেব, পৃ. ৩৯
৭. তদেব, পৃ. ৩৯
৮. ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার (সংকলিত), কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃ. ১৮
৯. তদেব, পৃ. ১৮
১০. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কোলকাতা, ২০০২, পৃ. ১২৪
১১. দাশ গুপ্ত, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র (সম্পা.), সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ(মনসামঙ্গল), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ১৫৪
১২. তদেব, পৃ. ১৫৩
১৩. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২১৫
১৪. দাশ গুপ্ত, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র (সম্পা.), সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ(মনসামঙ্গল), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃ. ৯৭
১৫. নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২১৯

১৬. ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার (সংকলিত), কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃ. ২৩৮

১৭. তদেব, পৃ. ২৪০

১৮. বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কোলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৭৭

১৯. ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার (সংকলিত), কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪২, পৃ. ১৮৫

২০. তদেব, পৃ. ২২৮

২১. তদেব, পৃ. ২২৯

Bibliography:

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৫

নস্কর, সনাতন (সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৭

বিশ্বাস, অচিন্ত্য, বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, কোলকাতা, ২০০২

দাশ গুপ্ত, শ্রীতমোনাশ চন্দ্র, সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪৭

ভট্টাচার্য, শ্রী বসন্ত কুমার, কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৩৪২

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), মনু-সংহিতা, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬

সেনগুপ্তা, জয়া, মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০১

দাস, অপু, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ, বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০১৬

রায়, বিশ্বনাথ (সম্পা.), কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪

সহায়ক পত্রিকা :

মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা, শারদ ২০১৬